প্রথম অধ্যায়
সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

[বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈশ্বিক মন্দার অভিঘাত মোকাবিলায় যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে এর প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৬৬ শতাংশে, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ০.৬ শতাংশ বেশি। কৃষি খাতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার পাশাপাশি শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ঘুরে দাঁড়ানো এবং সেবা খাতের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি সার্বিকভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রেখেছে। এসময়ে রাজস্ব আহরণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও সুষ্ঠু বাজেট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং রাজস্ব খাতে শৃঙ্খলাও বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বজায় থাকা ও মন্দাপরবর্তী বিশ্বব্যাপী পণ্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে যেমন উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী খাদ্য পণ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক ও রাজস্ব খাতে গৃহীত ব্যবস্থার পাশাপাশি মুদ্রাখাতেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি রোরো মৌসুমে ভাল উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য পণ্যের মূল্য মার্চ ২০১১ থেকে স্থিতিশীল থাকায় আগামী মাসসমূহে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস ও বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১০-১১ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত হ্রাস পেয়েছে। এসময়ে বিনিময় হারের কিছুটা অবচিতি ঘটেছে। তা সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মোটামুটি স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। জানুয়ারি ২০১১ থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ধারায় ফিরে এসেছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং অবকাঠামো খাতে সরকার যে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করেছে তার সফল বাস্তবায়ন অর্থনীতিতে অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি করবে যা দেশকে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।]

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

২০০৭-২০০৯ সাল ব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা থেকে বিশ্ব অর্থনীতি প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালেও এ ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া চলছে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গতিতে। মন্দা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে দু'টি ধারা দেখা যাচ্ছে। এর একটি হলো উন্নত বিশ্বে প্রত্যাশার চাইতে কম গতিতে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া চলতে থাকা। একইসাথে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ বিপুল বাজেট ঘাটতি, উচ্চ সরকারি ঋণ (public debt) ও বেকারত্বের হার বৃদ্ধিসহ ইউরো অঞ্চলের কয়েকটি দেশের সার্বভৌম ঋণ (sovrein debt) সমস্যা প্রবৃদ্ধির গতিকে ঝুঁকিপূর্ণ করেছে। অন্যদিকে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দ্রুত পুনরুদ্ধারের সাথে মূল্যস্ফীতির চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর World Economic Outlook (WEO), April 2011 অনুযায়ী ২০১০ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫ শতাংশে। ২০১১ সালে এ প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৪.৪ শতাংশে, যা ২০১২ সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। উন্নত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১০ সালে ৩ শতাংশ হলেও ২০১১ ও ২০১২ সালে তা যথাক্রমে ২.৪ শতাংশ ও ২.৬ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। অন্যদিকে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১০ সালে ৭.৩ শতাংশে উন্নীত হলেও পরবর্তী দুই বছর তা ৬.৫ শতাংশে থাকবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১০ সালে ৯.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা পরবর্তী দু'বছর ৮.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের শুরুতে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়তে থাকলেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় শুরু না হওয়ায় উন্নত অর্থনীতির মূল্যস্ফীতি সীমিত পর্যায়ে ছিল। তবে বিশ্বব্যাপী খাদ্যপণ্য ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির কারণে উন্নত অর্থনীতির মূল্যস্ফীতির হার ২০১০-এ ১.৬ শতাংশ থেকে ২০১১-এ ২.২ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, অভ্যন্তরীণ চাহিদা বজায় থাকা এবং খাদ্যপণ্য ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি পুঁজি স্থানান্তর প্রবাহ (capital inflow) বৃদ্ধির ফলে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির মূল্যস্ফীতি ২০১০ সালের ৬.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১১-এ ৬.৯ শতাংশে দাঁড়ানোর পূর্বাভাস করা হয়েছে।

২০১০ সালে বিশ্ব বাণিজ্য পুনরুদ্ধার শুরু হয় এবং এ বছর বিশ্ব বাণিজ্য ২১.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। আইএমএফ এর Outlook, April 2011 অনুযায়ী ২০১১ ও ২০১২ সালে বিশ্ব বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৭.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে। মন্দাকালীন সময়ে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণও (volumn) ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় এবং হ্রাস পাওয়ার এ হার বিশ্ব জিডিপি প্রবৃদ্ধি হ্রাসের তুলনায় অনেক বেশি। Outlook-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০০৯ সালে মোট বিশ্ব বাণিজ্যের (পণ্য ও সেবা) পরিমাণ হ্রাস পায় ১০.৯ শতাংশ। এ সময়ে উন্নত অর্থনীতির আমদানি ও রপ্তানি হ্রাস পায় যথাক্রমে ১২.৬ শতাংশ ও ১২.২ শতাংশ। পক্ষান্তরে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছিল যথাক্রমে ৮.৩ শতাংশ ও ৭.৫ শতাংশ। ২০১০ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২.৪ শতাংশ, যার মধ্যে উন্নত অর্থনীতির আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ১১.২ শতাংশ ও ১২.০ শতাংশ। অন্যদিকে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১৩.৫ শতাংশ ও ১৪.৫ শতাংশ। পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১১ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৭.৪ শতাংশে যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২০১২ সালে দাঁড়াবে ৬.৯ শতাংশে।

বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় কিছু নিম্নমুখী ঝুঁকি (downside risk) এখনও রয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি উন্নত দেশের চলতি হিসাবে বিশাল আকারের ঘাটতি এবং জ্বালানি তেল রপ্তানিকারক দেশ ও চীনসহ কয়েকটি বিকাশমান অর্থনীতির চলতি হিসাবে বিশাল আকারে উদ্বৃত্ত বিশ্ব অর্থনীতিকে ভারসাম্যহীন করে তুলেছে। এ ভারসাম্যহীনতা কমিয়ে আনার ব্যর্থতা বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে (regulatory system) নাজুক অবস্থায় ফেলতে পারে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নীতি নির্ধারণে সমন্বয়ের অভাবও বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার কার্যক্রমকে বিলম্বিত করতে পারে। সরকারি ঋণের দ্রুত বৃদ্ধি রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে চাপের মধ্যে ফেলতে পারে যা পরবর্তীতে ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাকেও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করতে পারে। সম্প্রতি জাপানে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভূমিকম্প ও সুনামি এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিপর্যয় এর প্রভাব বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সীমিত হলেও এখনও তা ঝুঁকির কারণ। এছাড়া, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি চাপ সৃষ্টিসহ প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী ঝুঁকি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতি ও বাংলাদেশ

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার শুরুতে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর এর বিরূপ প্রভাব না পড়লেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিক থেকে রপ্তানি ও আমদানি খাতে কিছুটা প্রভাব পড়ে যা ২০০৯-১০ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ দুই অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০.৩১ শতাংশ ও ৪.১১ শতাংশ। অন্যদিকে এ দুই অর্থবছরে আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.০৬ শতাংশ ৫.৪৭ শতাংশ। বিশ্ববাণিজ্যের ঋণাত্মক গতিধারার নিরিখে বাংলাদেশ রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের এ প্রবৃদ্ধির হার সন্তোষজনক। অধিকন্তু, এসময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য হ্রাসও এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। মন্দাপরবর্তী বিশ্ব বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশেরও বৈদেশিক বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় এবং চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪০.৩১ শতাংশ ও ৪০.৫৯ শতাংশ। বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বিশ্বমন্দার সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে যথাযথ আগাম ধারণা অর্জন এবং সে প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক উদ্যোগ ও প্রণোদনা প্যাকেজের মত নানাবিধ সহায়তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মন্দার বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। মন্দার প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্যে আবাসন শিল্পে ধ্বস নামা এবং মালয়েশিয়াসহ কয়েকটি দেশে অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশ হতে শ্রমশক্তি রপ্তানি কিছুটা হ্রাস পায়। তবে এসময় রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে থাকে এবং ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয় যথাক্রমে ২২.৪২ শতাংশ ও ১৩.৪০ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথমার্ধে জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও জানুয়ারি, ২০১১ থেকে তা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। জনশক্তি রপ্তানির চলমান প্রচেষ্টার ফলে পরিস্থিতির আরো উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

গত ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৭৪ ও ৬.০৭ শতাংশ। উল্লেখ্য, এসময়ে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা থাকলেও শিল্পখাতে বিশেষ করে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত এবং সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি মন্দাপূর্ব সময়ের তুলনায় হ্রাস পায়। প্রবৃদ্ধি অর্জনের এ ধারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ৬.৬৬ শতাংশে উন্নীত

হয়েছে। এ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থবছরে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৪.৯৬ শতাংশ, ৮.১৬ শতাংশ এবং ৬.৬৩ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ খাতসমূহে প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৫.২৪ শতাংশ, ৬.৪৯ শতাংশ এবং ৬.৪৭ শতাংশ। কৃষি খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাপক সরকারি সহায়তা যেমন - পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষি ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে। সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবগুলো খাতই মোটামুটি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখায় এ খাতের প্রবৃদ্ধিও সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮১৮ ও ৭৫৫ মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৭৫১ ও ৬৮৭ মার্কিন ডলার।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ছিল জিডিপি'র ২০.১০ শতাংশ যা ২০১০-১১ অর্থবছরে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ১৯.৫৯ শতাংশে। অন্যদিকে বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায় ২০১০-১১ অর্থবছরে বিনিয়োগ জিডিপি'র ২৪.৭৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ১৯.৪৬ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৫.২৮ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র ২৪.৪১ শতাংশ। যারমধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ১৯.৪০ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৫.০১ শতাংশ। বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে সরকারের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। পক্ষান্তরে, রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাসের ফলে ২০১০-১১ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় গত অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় জিডিপি'র ৩০.০২ শতাংশ থেকে জিডিপি'র ২৮.৪০ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।

মূল্যস্ফীতি

বিশ্ব অর্থনীতি মন্দাবস্থা কাটিয়ে ওঠার সাথে সাথে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, ২০১০ সালে খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। এ বছর খাদ্য উৎপাদনকারি বিভিন্ন দেশে বিরূপ আবহাওয়াজনিত কারণে খাদ্য মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। অভ্যন্তরীণ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কতিপয় রাষ্ট্র কর্তৃক খাদ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা মূল্যস্ফীতির চাপকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। আইএমএফ-এর সার্বিক পণ্য মূল্য সূচক (IMF Overall Commodity Price Index) জানুয়ারি ২০১০ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত সময়ে ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি প্রধানত ২০১০ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রকট হলেও সম্প্রতিক সময়ে উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে চলমান অস্থিরতা জ্বালানি তেলের মূল্যের ওপর নতুনভাবে চাপ সৃষ্টি করছে। এর ফলে জ্বালানি তেলের মূল্য জানুয়ারি ২০১১-এ ব্যারেল প্রতি ৯৫ মার্কিন ডলার থেকে মার্চ ২০১১-এ ব্যারেল প্রতি ১১০ মার্কিন ডলারে পৌঁছে।

এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বিশেষ করে খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার মার্চ ২০১১ মাসে ১০.৪৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা মার্চ ২০১০-এ ছিল ৮.৭৮ শতাংশ। এসময়ে খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ১০.৮০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.৮৭ শতাংশে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার ৫.৬০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৪.৩২ শতাংশে দাঁড়ায়। সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১১) গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৮.১৭ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে (জুলাই-মার্চ, ২০১০) গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬.৮৯ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০০৯-১০ অর্থবছরের বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৭.৩১ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সরকার প্রশাসনিক, রাজস্ব ও মুদ্রা খাতে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং, খোলা বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিক্রি (ওএমএস) ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য মওজুত গড়ে তোলা। রাজস্ব ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নিত্য প্রয়োজনীয় কতিপয় পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস/পুনর্বিন্যাস ও কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে, কৃষি উপকরণের (যথা-সরা, বীজ, সেচের জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ) ওপর ভর্তুকি প্রদান। পাশাপাশি ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য যাতে মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করতে না পারে সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক-এ তফসিলি ব্যাংকসমূহের নগদ জমা

আবশ্যকতা (Cash Reserve Requirment-CRR) এবং সংবিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণ হার (Statutory Liquidity Ratio-SLR) হার বৃদ্ধি করাসহ নীতি নির্ধারণী সুদের হার যথা রেপো ও রিভার্স রেপোর সুদের হার পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এবছর বোরোর উৎপাদন ভাল হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিজাত খাদ্য পণ্যের মূল্য একনাগারে আট মাস বৃদ্ধির পর মার্চ ২০১১ থেকে মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। ফলে আগামী মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতির চাপ কমতে থাকবে বলে আশা করা যায়।

রাজস্ব খাত

রাজস্ব আহরণ

চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৯৫,১৮৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.১ শতাংশ)। যার মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব ৭৫,৬০০ কোটি টাকা, এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৩,৪৫২ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ১৬,১৩৬ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রথম নয় মাসে (মার্চ ২০১১ পর্যন্ত) আহরিত হয়েছে এনবিআর কর রাজস্ব ৫৩,০৪৪ কোটি টাকা, এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব ২,২৪৭ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ১০,৭৭২ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে প্রথম নয় মাসে মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৬৬,০৬৩ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের মোট রাজস্ব আহরণ অপেক্ষা ২৩.৪ শতাংশ বেশি।

চলতি অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত এনবিআর কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৭.২৮ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১৮.৩ শতাংশ। এসময়ে (মার্চ ২০১১ পর্যন্ত) খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে - আমদানি শুল্ক: ২৩.২৬ শতাংশ, আমদানি পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর: ১৬.৮৪ শতাংশ, আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক: ২৫.৮৪ শতাংশ, স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর: ৩০.১৬ শতাংশ, স্থানীয় পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক: ২৯.৫২ শতাংশ এবং আয়কর: ৩৪.৫৫ শতাংশ। আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে আমদানি শুল্কখাতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, করের আওতা বৃদ্ধি ও কর প্রদানে জনসচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা কার্যক্রম যেমন কর মেলা, রোড শো ইত্যাদি আয়োজনের ফলে আয়কর খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে। জুলাই-মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ১৮.৩৯ শতাংশ এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৮৫ শতাংশ।

সরকারি ব্যয়

২০১০-১১ অর্থবছরের মূল বাজেটে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ১,৩২,১৭০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৬.৯ শতাংশ), যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ৯৭,১৭০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.১ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৩৮,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৯ শতাংশ)। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় বিশেষ করে এডিপিতে তে বরাদ্দকৃত বৈদেশিক সহায়তার ব্যয় সন্তোষজনক না হওয়ায় সংশোধিত এডিপিতে বৈদেশিক সহায়তার প্রাক্কলন হ্রাস করে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩৫,৮৩০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেল ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে কৃষি উপকরণ, খাদ্য-পণ্য এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভর্তুকি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে সার্বিকভাবে সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন দাঁড়িয়েছে ১,২৯,৮৭৬ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৬.৪ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুয়ায়ী অর্থবছরের প্রথম নয়মাসে মোট ব্যয় হয়েছে ৮১,৯৩০ কোটি টাকা, যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ৬৪,৪২১ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ১৭,৫০৯ কোটি টাকা।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

২০১০-১১ অর্থবছরে মূল বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৯,৩২৩ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি কমে দাঁড়াবে ৩৪,৬৮৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ)। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস হতে ৯,৮৭১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৩ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ২৪,৮১৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.১ শতাংশ) সংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক খাত

বিশ্বব্যাপী খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি বিশেষ করে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করে। ফলে অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন ভাল হওয়া সত্ত্বেও দেশে মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়তে থাকে। এ প্রেক্ষিতে মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে

বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে চলতি অর্থবছরে রেপো ও রিভার্স রেপো হার তিন দফায় ১৭৫ বেসিস পয়েন্টস্ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৬.২৫ শতাংশ ও ৪.২৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করে। একইসাথে ১৫ ডিসেম্বর, ২০১০ থেকে CRR এবং SLR উভয়ই ৫০ বেসিস পয়েন্টস্ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৬ শতাংশ ও ১৯ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এসময় কতিপয় ব্যাংক ঋণ-আমানত অনুপাতের সীমা অতিক্রম করায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং প্রতিরোধমূলক তদারকি ব্যবস্থা চালু করাসহ জুন, ২০১০ থেকে ব্যাংকগুলোকে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য অনুমোদিত সর্বোচ্চ সীমা (ceiling) পরিপালনে নজরদারিও জোরদার করে। তবে অভ্যন্তরীণ ঋণ চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য হারে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ডিসেম্বর, ২০১০ হতে ব্যাংকগুলো কিছুটা তারল্য ঝুঁকিতে পড়ে। মুদ্রাবাজারের বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে মূল্যস্ফীতি উর্ধ্বমুখী থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক রেপোর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে তারল্য সহায়তা দিয়ে আসছে। বর্তমানে মুদ্রাবাজরে তারল্য প্রবাহ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মার্চ ২০১১ মাসে শেষে ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য (excess liquidity) দাঁড়িয়েছে ২৭,০৮৭ কোটি টাকা।

ব্যাপক মুদ্রা

ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে ২২.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী ২০০৮-০৯ অর্থবছর শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৯.১৭ শতাংশ। বছরভিত্তিতে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পায় ২১.৬৬ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২১.৯০ শতাংশ। এসময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা) ফেব্রুয়ারি'১০-এ ১৬.০৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪.৮ শতাংশে। একই সময়ের ব্যবধানে তলবি আমানতের প্রবৃদ্ধি ৩৩.৬৯ শতাংশ থেকে ৩১.৭৮ শতাংশে এবং মেয়াদি আমানতের প্রবৃদ্ধি ২১.৪৫ শতাংশ থেকে ১৯.৮১ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ সম্প্রতিক সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। ব্যাপক মুদ্রার স্থিতি ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে (জুন'১০ শেষে) ছিল ৩,৬৩,০৩১ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে দাঁড়িয়েছে ৪,০৬,৭৮৫ কোটি টাকায়।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

বার্ষিকভিত্তিতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭.৮৯ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৬.০৩ শতাংশ। এসময়ে বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায় বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ পূর্ববর্তী ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১৪.৬২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.২৭ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে সরকারি খাতে নীট ঋণ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ২৪.০৪ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৬.৫২ শতাংশ হ্রাস পায়। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ২৬.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাস শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৩৩ শতাংশ। এসময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাস শেষের ১৯.৫২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৩৪ শতাংশে দাঁড়ায়, যা মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন; কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ঋণ এবং মেয়াদি শিল্প ঋণসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিতে জোরালো অবদান রাখে।

রিজার্ভ মুদ্রা

বার্ষিকভিত্তিতে ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬.০৩ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৩৫.৪৫ শতাংশ। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ৪২.৫২ শতাংশ হলেও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ হ্রাস পায় ২৬.১৩ শতাংশ। রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে নীট বৈদেশিক সম্পদের এ প্রবৃদ্ধি ঘটে। অন্যদিকে সন্তোষজনক রাজস্ব আয় ও সঞ্চয় পত্র থেকে সরকারের অর্থায়ন বৃদ্ধির ফলে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের নীট ঋণ গ্রহণ ঋণাত্মক হয়। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষের রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসের প্রবৃদ্ধি ২৫.৭ শতাংশের তুলনায় হ্রাস পেয়ে ২০.৭৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আমদানি ব্যায় বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের শ্লথ গতি ফলে নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ৮৪.৩১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ১.৬৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ব্যাপক ব্যাপক মুদ্রা গুণক জুন ২০০৯ শেষের ৪.২৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১০ শেষের ৪.৫১ এ দাঁড়ায়। ২০১০-১১ অর্থবছর ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রার গুণক দাঁড়ায় ৪.৬১।

সুদের হার

মূল্যস্ফীতির চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকায় বাজারে মুদ্রা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আগষ্ট ২০১০ থেকে রেপো ও রিভার্স রেপোর সুদের হার ১০০ বেসিস পয়েন্টস্ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৫.৫ শতাংশ ও ৩.৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করে। এতে বাজারে তারল্য প্রবাহ কিছুটা হ্রাস পায় এবং আন্তঃব্যাংক কলমানির ভারিত সুদের হার ৬.৩৬ শতাংশে দাঁড়ায়। মূল্যস্ফীতির চাপ উর্ধ্বমুখী থাকার প্রেক্ষিতে রেপো ও রিভার্স রেপোর সুদের হার গত ১৩ মার্চ ২০১১ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্টস্ এবং সর্বশেষ ২৭ এপ্রিল ২০১১ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্টস্ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৬.২৫ শতাংশ ও ৪.২৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

৯১-দিন মেয়াদি ট্রেজারী বিলের ভারিত সুদের হার জুলাই ২০১০-এ ২.৪৩ শতাংশ থেকে মার্চ ২০১১ তে ৫.৪৮ শতাংশে দাঁড়ায়। ১৮২-দিন মেয়াদি এবং ৩৬৪-দিন মেয়াদি ট্রেজারী বিলের ভারিত সুদের হার জুলাই ২০১০ থেকে মার্চ ২০১১ পর্যন্ত সময়ে প্রায় ২.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ সরকারের ট্রেজারী বিলসমূহের (৫-বছর, ১০-বছর, ১৫-বছর ও ২০-বছর) ভারিত সুদের হারও এসময়ে বৃদ্ধি পেলেও তা ১ শতাংশের নীচে রয়েছে। ।

চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সিদ্ধান্ড় এবং উৎপাদনশীল খাতসহ অন্যান্য খাতে সুদের হার হ্রাসের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে ১৯ এপ্রিল ২০০৯ থেকে কৃষিখাত, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদি ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণ, গৃহায়ন এবং বাণিজ্যে অর্থায়ন খাতে ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার ১৩ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছিল। মন্দাপরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং কতিপয় ব্যাংক কর্তৃক আমানতের সুদের হার বৃদ্ধির প্রবণতার প্রেক্ষাপটে সুদের হারকে বাজারভিত্তিক করার জন্য কৃষি ও মেয়াদি শিল্প ঋণ ব্যতীত অন্যান্য খাতে সুদের হারের উচ্চ সীমা তুলে নেয়া হয়েছে। তবে চলতি মুলধনসহ কতিপয় খাতে সুদের হার যাতে যৌক্তিক পর্যায়ে থাকে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর ওপর নৈতিক চাপ (moral suasion) প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে।

ভারিত গড় (weighted average) ঋণ প্রদানের সুদের হার জুন ২০০৯-এ ১৩.৪৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১০-এ ১২.৩৭ শতাংশে দাঁড়ায়। একই সময়ে ভারিত গড় আমানতের সুদের হার ৮.২৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৭.৪০ শতাংশে দাঁড়ায়। ফলে জুন ২০০৯-এ সুদের হারের ব্যাপ্তি (interest rate spread) ৫.২০ শতাংশ থেকে জুন ২০১০-এ ৪.৯৭ শতাংশে হ্রাস পায়। ২০১০-১১ অর্থবছরের মার্চ মাসে ভারিত গড় ঋণ প্রদানের সুদের হার ও আমানতের সুদের হার বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১২.৫২ শতাংশ ও ৭.৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে সুদের হারের ব্যাপ্তি জুন ২০১০-এর তুলনায় প্রায় একই রয়েছে।

পুঁজিবাজার

২০০৯-১০ অর্থবছরে পুঁজিবাজারে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও ২০১০-১১ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরের জুন মাস শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এর সাধারণ মূল্যসূচক ৬,১৫৩.৬৮ এবং বাজার মূলধন জিডিপি'র ৩৯ শতাংশে দাঁড়ায়। পুঁজিবাজারের প্রতি সাধারণ জনগণের আগ্রহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এসময়ে বাজার মূলধন ও মূল্যসূচকের উলেণ্টখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১০ মাস শেষে ডিএসই'র সাধারণ মূল্যসূচক ৮,২৯০.৪১-এ পৌঁছে যা, জুন ২০১০-এর তুলনায় ৩৪.৭২ শতাংশ বেশি। একইভাবে বাজার মূলধন জিডিপি'র ৪৪.৯৬ শতাংশে পৌঁছে। জানুয়ারি ২০১১ মাসের শুরু থেকেই পুঁজিবাজারে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ১২ মে ২০১১-এ ডিএসই'র সাধারণ মূল্যসূচক হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫৬১২.৫২-এ, যা ডিসেম্বর ২০১০ এর তুলানায় প্রায় ৩২.৩ শতাংশ কম। একইভাবে বাজার মূলধন জিডিপি'র ৩৩.০৫ শতাংশে নেমে আসে। Price Earnings (P/E) Ratio জানুয়ারি ২০১১-এর ২৯.৩৫ থেকে কমে ১২ মে ২০১১-এ ১৪.৬৫ এ দাঁড়ায়।

সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভূত পুঁজিবাজারের অস্থিরতা কাটিয়ে পুঁজিবাজারের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং বাজারকে যথাযথভাবে পরিচালনার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে বুক বিল্ডিং পদ্ধতির সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পুঁজিবাজারে তারল্যপ্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে আইসিবি'র উদ্যোগে ৫,০০০ কোটি টাকার 'বাংলাদেশ ফান্ড' নামে একটি মেয়াদবিহীন (open end) মিউচ্যুয়্যাল ফান্ড গঠন করা হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে পুঁজিবাজারে সংঘঠিত ঘটনা তদন্ড়ের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনের

বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া, সরকার অবিলম্বে, স্বল্পমেয়াদে এবং মধ্যমমেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

বৈদেশিক খাত

রপ্তানি

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা গভীর হওয়ার প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কিছুটা শ্লথ হয়। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির এ শ্লথ ধারা ২০০৯-১০ অর্থছরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বজায় থাকে এবং এ ৬ মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ঋণাত্মক ৬.২৬ শতাংশে। মন্দা পরিস্থিতির উন্নতির ফলে গত অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঘুরে দাঁড়ায় এবং জানুয়ারি-জুন, ২০১০ সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ১৪.৩৯ শতাংশ। সার্বিকভাবে ২০০৯-১০ অর্থবছরে রপ্তানি ৪.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬,২০৪.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

মন্দা পরিস্থিতি থেকে বিশ্ব অর্থনীতি বেরিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতও তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় ২৯.৪৬ শতাংশ। দ্বিতীয় প্রান্তিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩.৫৩ শতাংশে দাঁড়ায়, তবে তৃতীয় প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা কমে ৩৯.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সার্বিকভাবে ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে রপ্তানি ৪০.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮,২৪৩.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। রপ্তানির এ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে মূল ভূমিকা রেখেছে ওভেন পোশাক (৩৮.৫৮ শতাংশ), নীটওয়ার (৪৫.৮৯ শতাংশ), কাঁচা পাট (৬৯.২০ শতাংশ), পাটজাত পণ্য (৩৪.৮৮ শতাংশ), চামড়া (৩৬.৩৮ শতাংশ) এবং হিমায়িত খাদ্য (৫৩.৬২ শতাংশ) প্রভৃতি।

সরকার রপ্তানি খাতকে সহায়তার জন্য ইত:পূর্বে ঘোষিত প্রণেদনা প্যাকেজের বেশকিছু সুবিধা বর্তমানেও অব্যাহত রেখেছে। পণ্যের বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার অন্বেষণের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজে ঘোষিত New Market Exploration Assistance-এর আওতায় উদ্যোক্তাদের বর্ধিত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে নতুন বাজার হিসেবে জাপান, কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্কে বাংলাদেশের পণ্যের রপ্তানির বাজার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া সম্ভাবনাময় নতুন রপ্তানি খাত জাহাজ শিল্পেও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। জানুয়ারি ২০১১ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে তৈরী পোশাক রপ্তানির ক্ষত্রে Generalised System of Preference (GSP) এর আওতায় Rules of Origin শিথিল করায় এ অঞ্চলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

আমদানি

২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১০) আমদানি ব্যয় (সিআইএফ) পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৫৩ শতাংশ হ্রাস পেলেও অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আমদানি ব্যয় বাড়তে থাকে এবং এসময়ে ১৭.৬২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। সার্বিকভাবে ২০০৯-১০ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় ৫.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,৭৩৮.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১১) আমদানি ব্যয় ৪০.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪,১৬৮.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিশেষ করে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি, শিল্পের কাঁচামাল ও খাদ্যপণ্য আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সার্বিকভাবে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানিসহ পণ্যমূল্য বৃদ্ধিও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিতে কিছুটা প্রভাব ফেলেছে।

আমদানি পণ্যের ধরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ঋণপত্র নিষ্পত্তির ভিত্তিতে জুলাই-মার্চ, ২০১১ সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় মূলধনী যন্ত্রপাতির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪৩.৯৮ শতাংশ, শিল্পের কাঁচামাল ৫২.৪৩ শতাংশ, পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম জাত পণ্য ৪২.৯৭ শতাংশ এবং ভোগ্যপণ্য ৩২.৩২ শতাংশ। এসময়ের মোট আমদানির নিরিখে এ খাতসমূহের অংশ হলো যথাক্রমে ৬.৫ শতাংশ, ৩৯.২৯ শতাংশ, ৯.৭৮ শতাংশ এবং ১১.৩০ শতাংশ। ঋণপত্র খোলার ভিত্তিতে এসময়ে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামালের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৬৯.৭৬ শতাংশ ও ৬৬.৪৩ শতাংশ, যা অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স

বৈশ্বিক মন্দা ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। মন্দা পরবর্তী সময়ে এসব দেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরালো হলেও সম্প্রতি উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহে চলমান রাজনৈতিক সংকট এবং মধ্যপ্রাচ্যে এর ব্যাপ্তি জনশক্তি রপ্তানির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৪.২৭ লক্ষ জনশক্তি বিদেশ গমন করে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৩৪.৩১ শতাংশ কম। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত) ৩.৪২ লক্ষ জনশক্তি বিদেশ গমন করেছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৮৩ শতাংশ কম। উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে থেকে উত্তরণ এবং নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণসহ বেশ কিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে জনশক্তি রপ্তানি পুরোদমে শুরু করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করার পাশাপাশি কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে নতুন শ্রম উইং খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিদেশে চাহিদা রয়েছে এমন কাজের উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কয়েকবছর বন্ধ থাকার পর সৌদি আরবে আবার জনশক্তি রপ্তানি শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, জানুয়ারি ২০১১ থেকে জনশক্তি রপ্তানি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে জনশক্তি রপ্তানির এ নিম্নমুখী প্রবণতা কেটে যাবে।

২০০৯-১০ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ প্রথমবারের মত ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। এ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহ এসেছে ১০,৯৮৭.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৩.৪ শতাংশ বেশি। তবে চলতি অর্থবছরের নভেম্বর পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হলেও ডিসেম্বর মাস থেকে তা কেটে গেছে এবং শ্লথ গতির হলেও অর্থবছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৪.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৭৮৭.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের এ স্বল্প প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বিশ্বের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রাপ্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন ঘটেছে। বিশ্ব ব্যাংক-এর Migration and Remittance Trends 2009 - প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৮ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্সপ্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। বিশ্বব্যাংকের রেমিট্যান্স সংক্রান্ত ডাটাবেস অনুযায়ী ২০০৯ সালের বাংলাদেশের এ অবস্থান ৮ম স্থানে উন্নীত হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের Migration and Remittances Factbook 2011, এর প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান আরো এক ধাপ এগিয়ে ৭ স্থানে উন্নীত হয়েছে।

বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য

চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ পণ্য রপ্তানি ও আমদানি (Merchandise export and import) প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৪০.৬১ শতাংশ ও ৪১.১৪ শতাংশ হলেও গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বাণিজ্য ঘাটতি (Trade deficit) বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২.২০ শতাংশ। রপ্তানির তুলনায় আমদানির ভিত্তি বড় হওয়ার কারণে আমদানি-রপ্তানির প্রবৃদ্ধি কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্য ঘাটতির এ বৃদ্ধি ঘটেছে। এসময়ে সেবা (নীট) ও আয় (নীট) হিসাবে ঘাটতি বেড়েছে যথাক্রমে ৩৮.৮৭ শতাংশ ও ১৫.৩৪ শতাংশ। দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতির জন্য অবকাঠামোসহ বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের ফলে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির পশিাপাশি উদ্বৃত্ত আয়, মুনাফা/লভ্যাংশ বাবদ বৈদেশিক পরিশোধের কারণে সেবা এবং আয় খাতে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ায় চলতি হস্তান্তর খাতে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৩.৭৫ শতাংশ। ফলে জুলাই-মার্চ, ২০১১ সময়ে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৬৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে, গত অর্থবছরের একই সময়ে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২,৬৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জুলাই-মার্চ, ২০১১ সময়ে মূলধন ও আর্থিক হিসাবের মধ্যে মূলধন হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকলেও আর্থিক হিসাবে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১,২৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মূলত মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ হ্রাস পাওয়া এবং বাণিজ্য ঋণ বৃদ্ধির কারণে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে ঘাটতি বেড়েছে। ফলে সার্বিক ভারসাম্যে ঘাটতি হয়েছে ৫২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২,২৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ পূর্ববর্তী অর্থবছরের স্থিতি থেকে ৪৩.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা দ্বারা প্রায় ৫.৪ মাসের আমদানি ব্যয় মিটানো সম্ভব ছিল। ৩ মে ২০১১ মাসে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ১১,৩৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ৩ মে ২০১০-এর তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি এবং যা দিয়ে বর্তমানে ৪.৪ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। উল্লেখ্য, বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাসের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তেমন না বাড়লেও মোটামুটি স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে।

বিনিময় হার

২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে মুদ্রা বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত যোগান থাকায় মুদ্রা বিনিময় হার বিশেষ করে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্যসহ জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জ্বালানি তেলের আমদানি বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে টাকার বিনিময় হারে বিশেষ করে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারের অবচিতি (depreciation) ঘটে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার দাঁড়ায় ৭০.৪৮ টাকা। গত অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে টাকার গড় বিনিময় হার ৬৯.১৪ টাকার তুলনায় চলতি অর্থবছরের একই সময়ে টাকা অবচিত হয়েছে ১.৯৩ শতাংশ।

৮টি মুদ্রাঝুড়ির (currency basket) নিয়ে নির্ণীত টাকার নামিক কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Nominal Effective Exchange Rate Inedx-NEER Index) জুলাই ২০১০ মাসে ৬৭.৬৪ থেকে অবচিত (depreciate) হয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১১ মাসে ৬৩.৪৮ এ দাঁড়ায়। অন্যদিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate Index-REER Index) জুলাই ২০১১ মাসে ৯৬.৯৩ থেকে অবচিত (depreciate) হয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১১ মাসে ৯৪.১৮ এ দাঁড়ায়। এসময়ে REER ভিত্তিক টাকার বিনিময় হার ৬৭.২৯ টাকা থেকে মাত্র ০.১৮ শতাংশ অবচিত হয়ে ৬৭.১৭ এ দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, টাকার কার্যকর বিনিময় হার নামিক (nominal) বিনিময় হার অপেক্ষা কম থাকায় বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ এখনও রপ্তানি প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সংস্কার কর্মসূচি

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যে সকল সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

বাজেট ব্যবস্থাপনা

- সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯'-এর বিধানমতে প্রতি প্রান্তিকে বাজেট বাস্তবায়ন ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
- জাতীয় বাজেটকে সরকারের নীতির সাথে সম্পদ বন্টনকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহের কর্মকৃতি (performance indicator) সম্পর্কিত করে বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় আনা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন পরিস্থিতি আরো ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গত অর্থবছরের ন্যায় এ বছরেও প্রতি একনেক সভায় দু'টি করে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে গঠিত টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম পরিচালনা এবং বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত সর্বাধিক ব্যয়সাপেক্ষ ৫০ টি প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

রাজস্ব খাত

- কর আইন ২০১১ এবং ভ্যাট আইন ২০১১-এর খসড়া প্রণয়ন ও মতামতের জন্য তা ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে।
- রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৪টি Dedicated Bench স্থাপন করা হয়েছে।
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution) বিষয়ক আইনের খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- করের ভিত্তি সম্প্রসারণ এবং কর নেট বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে কর বিষয়ক প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা ও করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কর মেলা, জাতীয় কর দিবস উদযাপন, রোড শো প্রভৃতি কার্যক্রম চলছে।
- ঢাকাস্থ বৃহৎ করদাতা ইউনিট ও কর অঞ্চল-৮ এ পরীক্ষামূলকভাবে online- আয়কর রিটার্ণ দাখিলের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- ঢাকা কাস্টম হাউসকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল শুল্ক ষ্টেশনকে অনলাইনের আওতায় আনা এবং ASYCUDA++ software মাধ্যমে শুল্কায়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত

- আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতির সাথে সংগতি রেখে ব্যাংকসমূহকে অধিকতর ঝুঁকি-সংবেদনশীল এবং ব্যাংকিং শিল্পকে অধিকতর অভিঘাত (shocks) মোকাবেলায় সক্ষম ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপনের লক্ষ্যে জানুয়ারি, ২০১০ হতে ব্যাংকিং খাতে Regulatory Requirement হিসেবে মূলধন রূপরেখার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। তফসিলি ব্যাংকগুলোর জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধন পর্যাপ্ততার হার ১ জানুয়ারি ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত ন্যূনতম ৮ শতাংশ, ১ জুলাই ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত ন্যূনতম ৯ শতাংশ এবং ১ জুলাই ২০১১ থেকে পরবর্তী সময়ের জন্য ন্যূনতম ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, ন্যূনতম মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার জন্য ব্যাংক কোম্পানিসমূহকে আগষ্ট ২০১১ পর্যন্ত সময় প্রদান করা হয়েছে।
- পুঁজিবাজারে ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগের ঝুঁকি বিবেচনায় ব্যাংক কোম্পানি কর্তৃক কোন স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত স্টক ডিলার, শেয়ার ব্রোকারেজ ও মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে গঠিত নিজস্ব পৃথক সাবসিডিয়ারী কোম্পানি বা কোম্পানীগুলোকে প্রদত্ত যে কোন ধরনের ঋণ এবং এ উদ্দেশ্যে গঠিত অন্য কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিকে প্রদত্ত যে কোন ধরনের ঋণের অশ্রেণীকৃত অংশের বিপরীতে বিদ্যমান সাধারণ প্রভিশন ১ শতাংশ থেকে ২ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে।
- কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপভুক্ত সংস্থাকে যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন ব্যাংক কোম্পানি কর্তৃক প্রত্যক্ষ ঋণ সুবিধা তার মোট মূলধনের ১৫ শতাংশ এর বেশি না প্রদানের সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়েছে।
- ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণের অননুমোদিত (unauthorized) ব্যবহার রোধকল্পে ব্যাংকগুলোকে ঋণ ব্যবহারে সর্তককরণের লক্ষ্যে জুন ২০১০ থেকে ব্যাংকগুলো কর্তৃক পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য অনুমোদিত সর্বোচ্চ সীমা (ceiling) পরিপালনে নজরদারি জোরদারকরণ এবং অক্টোবর ২০১০ হতে ষ্টক এবং শেয়ারের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণের জন্য প্রভিশন আবশ্যকীয়তা দ্বিগুণ করে ২ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে।

পুঁজিবাজার

- বুক বিল্ডিং পদ্ধতি সংস্কারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধি Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006 সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- মিউচ্যুয়াল ফান্ড সংশ্লিষ্ট মূল্য সংবেদনশীল তথ্য যথাযথভাবে প্রচারের নিমিত্ত এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রাইভেট প্লেসমেন্ট সম্পর্কে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা ২০০১ গত ১৪ মার্চ ২০১১ তারিখে সংশোধন করা হয়েছে।
- স্টক এক্সচেঞ্জের মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও ট্রেডিং কার্যক্রম পৃথক করার লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ডিমিউচ্যুয়ালাইজেসন (Demutulisation of stock exchange) শুরু হয়েছে।

বীমা খাত

- বীমা খাতের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান, বীমা পলিসি গ্রাহক ও পলিসির অধীনে উপকারভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, বীমা খাতের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ এবং এ খাত পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান বীমা অধিদপ্তরকে বীমা আইনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০' বিলটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে Insurance Corporations (Amendment) আইন প্রণয়নের কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়েছে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

সার্বভৌম ঋণমান (Sovereign Credit Rating)

২০১০ সালে আন্তর্জাতিক ঋণমান নিয়ন্ত্রণকারী দু'টি প্রতিষ্ঠান-Standard and Poor's (S&P) এবং Moody's বাংলাদেশকে প্রথমবারের মত তাদের সার্বভৌম ঋণমান (Sovereign Credit Rating) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ রেটিং তালিকায় S&P এবং Moody's বাংলাদেশকে যথাক্রমে **BB-** এবং **Ba3** মান প্রদান করেছে। এ রেটিং অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিচারে বাংলাদেশ ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের পরে থাকলেও পাকিস্তান ও শ্রীলংকার উপরে রয়েছে। সম্প্রতি দুটি সংস্থাই এ ঋণমান পুনর্মূল্যায়ন করেছে। সার্বভৌম ঋণমানের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান গত বছরের মতই স্থিতিশীল রয়েছে। এরূপ রেটিং এর ফলে ঋণপত্রের খরচ হ্রাস পাবে এবং এতে আমদানি ব্যয় সাশ্রয় হবে। দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

কস্ট অব ডুয়িং বেজনেস (Cost of Doing Business)

বিশ্ব ব্যাংক এর আইএফসি কর্তৃক প্রকাশিত Doing Business 2010 প্রতিবেদনে ১৮৩ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১১১ তম। Doing Business 2011 প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ অবস্থান ৪ ধাপ উন্নিত হয়ে ১০৭ তম স্থানে রয়েছে। প্রতিবেদনে এসময়ে দু'টি সংস্কারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করেছে। এর একটি হলো ব্যবসা শুরু করার পদ্ধতি সহজকরা ও অনলাইনে রেজিষ্ট্রেশন এবং অপরটি সম্পত্তির হস্তান্তর ব্যয় হ্রাস।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zones)

সরকার দেশের পশ্চাৎপদ ও শিল্প সম্ভাবনাময় এলাকায় স্থানীয় ও রপ্তানিমুখী শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন- ২০১০' গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে সরকার রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপরেখা (২০১০-২০২১)' শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করেছে, যা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এ পরিকল্পনায় দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ উলেণ্টখ করে আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন দর্শন ও স্বপ্ন প্রতিফলন করা হয়েছে। এ দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা যেখানে দারিদ্র্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য কমে যাবে।

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)

সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থাৎ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) প্রণয়নের কাজ চলছে। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে সরকারের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য প্রতিফলিত

হবে, আর তা অর্জনের জন্য বিকল্প কি কি কৌশল অনুসরণ করা যেতে পারে তার উলেণ্টখ থাকবে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি ধরণের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয়, সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকবে। ২০১১-২০১৫ অর্থ বছর মেয়াদে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্ড়বায়িত হলে দেশে প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সামাজিক খাতে অগ্রগতি

অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি বাংলাদেশ সামজিক খাতেও উলেণ্টখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ 'প্রাথমিক শিক্ষায় প্রকৃত ভর্তির হার' এবং 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা আনয়ন' বিষয়ক দু'টি এমডিজি (Millennium Development Goals) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ 'চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূলকরণ' 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন', '৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যু হার কমানো' সংক্রান্ড় এমডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের পথে অগ্রগামী রয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ 'এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের বিস্ড়ার কমিয়ে আনা' এবং 'পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ' সংক্রান্ড় লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের পথে রয়েছে। সারণি ১.১ এ সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক কয়েকটি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরা হলো:

সারণি: ১.১: সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক কয়েকটি সচকে বাংলাদেশের অবস্থান

সূচক	ভিত্তি বছর, ১৯৯০/১৯৯১	বর্তমান অবস্থা (বছর)	এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা, ২০১৫
দ্রারিদ্র্য রেখার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যা (%)	৫৮.৮	৩১.৫ (২০১০)	২৯.০
প্রাথমিক শিক্ষায় নীট ভর্তির হার (%)	৬০.৫	৯১.৯ (২০০৮)	১০০
প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের নীট ভর্তি হার (%)	৫০.৮	৯৪.৭ (২০০৭)	১০০
ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত			
প্রাথমিক শিক্ষা	১০০ঃ৮৩	১০০ঃ১০১ (২০০৮)	১০০ঃ১০০
মাধ্যমিক শিক্ষা	১০০ঃ৫২	১০০ঃ১২০ (২০০৮)	
উচ্চ শিক্ষা	১০০ঃ৩৭	১০০ঃ৩২ (২০০৬)	
পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	১৪৬	৫৩.৮ (২০০৮)	৪৮
শিশু (০-১ বছর) মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	৯২	৪১.৩ (২০০৮)	৩১
মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে)	৫৭৪	৩৪৮ (২০০৮)	১৪৪
সুপেয় পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যা (%)	৭৮	৮৬ (২০০৯)	১০০

উৎস: The Millenium Development Goals, Bangladesh Progress Report 2009, GED, Planning Commission, BBS

বিদ্যুৎ খাতে পরিকল্পনা

সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাস্ড়বায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি তরল জ্বালানি (Natural Liquified Gas), কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল নাগাদ সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট ১৪,৭৭৩ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১,৩০১ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাণিজ্যিকভাবে ইতোমধ্যে চালু হয়েছে এবং ২,৭৩৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ২৯টি প্রকল্প নির্মাণাধীন রয়েছে। সার্বিক পরিকল্পনার আওতায় ২০১১ সালে আরও ২,০২৪ মেগাওয়াট, ২,০১২ সালে ২,১৫৭ মেগাওয়াট, ২০১৩

সালে ২,১৭৪ মেগাওয়াট, ২,০১৪ সালে ২,৩২৩ মেগাওয়াট, ২,০১৫ সালে ২,৩৫০ মেগাওয়াট ও ২,০১৬ সালে ২,৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রযাত্রায় কালিয়াকৈর -এ হাইটেক পার্কের মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৪৫৫টি উপজেলায় ডায়ালআপ ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট এর জন্য ইতোমধ্যে ১৫টি জেলা ও ২৫টি উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটল স্বাক্ষর প্রবর্তনের লক্ষ্যে ২০১০ সালে তথ্য প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা ২০১০ প্রণয়ন, লাইসেন্সিং (সাটিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) গাইডলাইন, সত্যয়নের রীতি-পদ্ধতির বিবরণ ও নিরীক্ষা গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১২ সালের মধ্যে ই-কমার্স সূচনার লক্ষ্যে বিধিমালা প্রণয়ন করে ৬টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফায়িং অথরিটি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদানের জন্য স্থাপিত আইসিটি ইনকিউবেটরে বর্তমানে ৪৭ টি কোম্পানির কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। এছাড়া, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ই-গভর্নেন্স এর অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে Access to Information Technology নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারি ক্রয়ে টেন্ডার প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদনের বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য Electronic Government Procurement (e-GP) নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রকল্প বাস্তবায়নকে প্রাতিষ্ঠনিক রূপ দেয়ার নিমিত্তে পিপিপি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পিপিপি অফিস স্থাপিত হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। পিপিপি'র আওতায় প্রকল্প অর্থায়নের জন্য গঠিত Bangladesh Infrastructure Finance Fund (BIFF) কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়েছে। ৩০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে দেশের সর্ববৃহৎ পিপিপির প্রকল্প Dhaka Elevated Expressway বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা

বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন এবং বাংলাদেশে এর সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় সরকার Bangladesh Climate Change Stretegy and Action Plan, 2009 (BCCSAP) ও 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' নীতিমালা প্রণয়ন এবং 'জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করেছে। 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে মোট ১,৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। এ ফান্ডের আওতায় ৪৯ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মেকাবিলায় সহায়তার জন্য ১১৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) নামে একটি তহবিল গঠন করেছে।

অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

মন্দাকালীন সময়ে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশে সামান্য নীচে নেমে গেলেও মন্দাপরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে মন্দাপূর্ব তিন বছর জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ৬ শতাংশের ওপরে ছিল। তবে এ সময়ে প্রবৃদ্ধির হারে কিছুটা নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মূলত বিনিয়োগ পরিস্থিতির স্থবিরতার কারণে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় এসময়ে সার্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেতে থাকে। উল্লেখ্য, ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে বিনিয়োগ জিডিপি'র ২৪ শতাংশের মধ্যে রয়েছে, যা ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

গত কয়েক বছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য সূচকসমূহের গতিধারা এবং পরিবর্তিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে কতিপয় অন্তর্নিহিত অনুমানের ওপর ভিত্তি করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১২-২০১৬ (Medium-

Term Macroeconomic Framework-MTMF, 2012-16) প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্যে গতি ফিরে আসা, রপ্তানি বাণিজ্যে দেশের সুদৃঢ় অবস্থান, রাজস্ব আহরণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি, কৃষিখাতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি, বেসরকারি খাতে ঋণ, বিশেষ করে মেয়াদি শিল্প ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি, মুলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি মধ্যমেয়াদে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ হালনাগাদ করতে সহায়তা করেছে।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছর নাগাদ ৮ শতাংশে উন্নীত হবে এবং পরবর্তী অর্থবছরেও প্রবৃদ্ধির এ উর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত থাকবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এসময়ে বিনিয়োগ বর্তমানে জিডিপি'র ২৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৩.৩ শতাংশে দাঁড়াবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৫.৫ শতাংশে এবং সরকারি বিনিয়োগ ৭.৮ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বর্তমানে জিডিপি'র ১৮.৮ শতাংশ থেকে মধ্যমেয়াদে ২৫.২ শতাংশে এবং জাতীয় সঞ্চয়ক জিডিপি'র ২৮.৩ শতাংশ থেকে ৩৩.৮ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। Incremental Capital Output Ratio (ICOR) মধ্যমেয়াদে ৪.১ এর কাছাকাছি থাকবে বলে এমটিএমএফ-এ অনুমান করা হয়েছে। তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সরকারের গুরুত্ব প্রদান এবং এসব খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি মানব পুঁজি (human capital) গঠনে সহায়তা করবে। ফলে দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে (working age population) উৎপাদনমুখী জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশ জনমিতিক সুবিধা (Demographic Dividend) পেতে পারে, যা প্রবৃদ্ধিকে আরো ত্বরান্বিত করবে।

বিদ্যুৎ খাতে সরকারের পথনকশা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ, জ্বালানির চাহিদা মেটাতে নতুন কূপ খনন, এলএনজি আমদানি, কয়লা উৎপাদন ও আমদানি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চাহিদা পূরণ বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাবে বলে আশা করা হয়েছে। যোগাযোগ খাতের উন্নয়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ এ খাতের বৃহৎ প্রকল্পসমূহ নির্মাণ অবকাঠামো সমস্যা দূরীকরণে সহায়তা করবে বলে মধ্যমেয়াদি কাঠামোতে বিবেচনা করা হয়েছে। একইসাথে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির যথাযথ গুণগত বাস্তবায়ন এবং পিপিপি উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়ার মাধ্যমে অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা (infrastructure bottlenecks) দূর করা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। এমটিএমএফ-এ আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস পেয়ে ৭ শতাংশে এবং মধ্যমেয়াদে তা প্রায় ৬ শতাংশে কমিয়ে আনার পূর্বাভাস করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখা এবং খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হয়েছে। একইসাথে মুদ্রা ব্যবস্থায়ও একাধিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যা মধ্যমেয়াদে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে বলে এমটিএমএফ-এ প্রত্যাশা করা হয়েছে।

এমটিএমএফ-এ ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপি'র ১২.৩ শতাংশ যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১.২ শতাংশ বেশি। প্রতিবছর গড়ে রাজস্ব আহরণ জিডিপি'র ০.৬-১.০ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৫.২ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য গৃহীত সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব খাতে কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে প্রত্যশা করা হয়েছে।

সরকারি ব্যয় চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (জিডিপি'র ১৬.৩ শতাংশ) থেকে ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৮.২ শতাংশে এবং ক্রমান্বয়ে তা ২০১৫-১৬ অর্থবছর নাগাদ জিডিপি'র ২০.২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরমধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি'র ৬.৫ শতাংশে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস থেকে নীট অর্থায়ন জিডিপি'র ২ শতাংশ হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নির্বাহ করা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে যার মধ্যে ব্যাংকিং উৎস থেকে ২.২ শতাংশ এবং ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে ০.৮ শতাংশ নির্বাহের পরিকল্পনা রয়েছে।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে জ্বালানি তেলের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে থাকবে বলে বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে জ্বালানি তেলের মূল্য অত্যধিক বেড়ে গেলে তা সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনায় চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অধিকন্তু, ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়ায় এখাতে সরকারের ভর্তুকি ব্যয়ও বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে বাজেট ঘাটতি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ট্যারিফ সমন্বয় করা প্রয়োজন হতে পারে।

এমটিএমএফ-এ মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হয়েছে। ৭ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং ৫ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রা এবং মুদ্রার আয় গতির পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে মধ্যমেয়াদে ব্যাপক মুদ্রার সরবরাহ ১৫.৫ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে এমটিএমএফ-এ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ১৮ শতাংশ থেকে ১৮.৫ শতাংশের মধ্যে রেখে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে এমটিএমএফ-এ অনুমান করা হয়েছে।

মন্দাপরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতিতে দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য অত্যন্ত জোরালো হয়েছে। চলতি অর্থবছরে রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৩০ শতাংশ ও ৪৫ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে রপ্তানি ও আমদানি স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসবে বলে এমটিএমএফ এ অনুমান করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১৬ -১৭ শতাংশ হারে এবং আমদানি প্রবৃদ্ধি ১৪ -১৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ফলে মধ্যমেয়াদে বাণিজ্য ঘাটতি ১০ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে আশা করা হয়েছে। দেশের রপ্তানি পণ্যের ৭৫ শতাংশ তৈরি পোশাক এবং প্রায় ৮০ শতাংশ পণ্যের গন্তব্যস্থল হলো উন্নত অর্থনীতি। উন্নত অর্থনীতির সংকোচন রপ্তানি আয়কে হ্রাস করতে পারে। পণ্যের বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার অন্বেষণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এ ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশের সার্বভৌম ঋণ সংকট সেসব দেশের ব্যাংকিং খাতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে না এবং তা সার্বিকভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে প্রভাবিত করবে না বলে অনুমান করা হয়েছে।

রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি চলতি অর্থবছরে ৫ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা আগামী অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশ এবং ক্রমান্বয়ে তা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা দীর্ঘায়িত হলে দেশের সর্ববৃহৎ এ শ্রমবাজারে জনশক্তি রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ লক্ষ্যে নতুন নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণের প্রচেষ্টা বৈদেশিক কর্মস্থান ও রেমিট্যান্স প্রবাহের ধারা বজায় রাখবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

চলতি হিসাবের ভারসাম্যে মধ্যমেয়াদে ঘাটতি পরিলক্ষিত হবে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা উদ্বৃত্ত অবস্থায় ফিরে আসবে বলে এমটিএমএফ-এ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য যন্ত্রপাতি এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জ্বালানি তেলের আমদানি বৃদ্ধির ফলে মধ্যমমেয়াদে চলতি হিসাবে ঘাটতি অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর কিছুটা চাপ বাড়তে পারে এবং মুদ্রার বিনিময় হারেও অবচিতি ঘটতে পারে। তবে বৈদিশিক মুদ্রার রিজার্ভ বর্তমান অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৬.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পোঁছাতে পারে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যা ৩ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। অধিকন্তু আইএমএফ এর Extended Credit Facility (ECF) এবং বিশ্ব ব্যাংকের Poverty Reduction Support Credit (PRSC)-এর আওতায় সহজ শর্তে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রাপ্তি লেনদেনের ভারসাম্যে সহায়তা করবে। মধ্যমমেয়াদে চলতি হিসাবের ঘাটতি অর্থনীতিতে কোন নেতিবাচক প্রভার ফেলবেনা বলে কাঠামোতে প্রত্যাশা করা হয়েছে। অধিকন্তু বিনিয়োগ বৃদ্ধি ফলে অর্থনীতির ভিত আরও সুদৃঢ় হবে এবং কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। সারণি ১.২-এ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কতিপয় সূচকের পূর্বাভাস দেখানো হলো।

সারণি ১.২ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোঃ ২০১২-২০১৬

খাত	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
	প্রকৃত	সাময়িক	প্রাক্কলিত			প্রক্ষেপণ		
প্রকৃত খাত								
চলতি মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	১২.৬	১২.৬	১৪.২	১৩.৮	১৩.৮	১৪.০	১৪.২	১৪.১
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	**৫.৭**	**৫.৮**	**৬.৭**	**৭.০**	**৭.২**	**৭.৬**	**৮.০**	**৮.২**
মূল্যস্ফীতি (%)	**৬.৭**	**৭.৩**	**৮.০**	**৭.৫**	**৭.০**	**৬.৮**	**৬.৫**	**৬.২**
মোট বিনিয়োগ (% জিডিপি)	**২৪.৪**	**২৫.০**	**২৬.৫**	**২৮.৮**	**২৯.৬**	**৩১.০**	**৩২.৫**	**৩৩.৩**
সরকারি	১৯.৭	২০.২	২১.১	২২.২	২২.৭	২৩.৮	২৫.০	২৫.৫
বেসরকারি	৪.৭	৪.৮	৫.৩	৬.৬	৬.৯	৭.২	৭.৫	৭.৮
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২০.১	১৯.০	১৮.৮	২০.৭	২১.৫	২২.৪	২৪.১	২৫.২
জাতীয় সঞ্চয়	২৯.৬	২৮.৮	২৮.৩	২৯.৮	৩০.৪	৩১.১	৩২.৮	৩৩.৮
রাজস্ব খাত (জিডিপি'র শতকরা হিসাবে)								
মোট রাজস্ব	**১০.৪**	**১০.৯**	**১২.০**	**১৩.২**	**১৩.৪**	**১৪.০**	**১৪.৬**	**১৫.২**
কর রাজস্ব	৮.৬	৯.০	১০.০	১০.৬	১১.২	১১.৮	১২.৪	১৩.০
এনবিআর কর রাজস্ব	৮.২	৮.৬	৯.৬	১০.২	১০.৮	১১.৪	১২.০	১২.৬
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪
কর বহির্ভূত	১.৮	১.৯	২.০	২.৫	২.২	২.২	২.২	২.২
মোট ব্যয়	**১৪.৩**	**১৪.৬**	**১৬.৩**	**১৮.২**	**১৮.৪**	**১৯.০**	**১৯.৬**	**২০.২**
অনুন্নয়ন বাজেট	১১.২	১০.৯	১১.৯	১৩.১	১৩.১	১৩.৩	১৩.৫	১৩.৭
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩.২	৩.৭	৪.৪	৫.১	৫.৩	৫.৭	৬.১	৬.৫
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	**-৩.৯**	**-৩.৭**	**-৪.৩**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**
অর্থায়ন								
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	**৩.১**	**২.২**	**৩.০**	**৩.০**	**৩.০**	**৩.০**	**৩.০**	**৩.০**
ব্যাংক ব্যবস্থা হতে	২.২	-০.৩	২.২	২.২	২.২	২.২	২.২	২.২
ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে	০.৯	২.৫	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	**০.৮**	**১.৪**	**১.২**	**২.০**	**২.০**	**২.০**	**২.০**	**২.০**
মুদ্রা খাত (অর্থবছর শেষে শতকরা পরিবর্তন)								
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৭.৮	১৮.৮	২০.৭	১৭.৩	১৬.১	১৬.০	১৬.০	১৫.২
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৫.৯	১৭.৬	১৭.৭	১৯.২	১৯.৫	১৯.৫	১৯.২	১৮.৯
বেসরকারি খাতে ঋণ	১৪.৬	২৪.২	১৮.০	১৮.০	১৮.০	১৮.৫	১৮.৫	১৮.৫
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৯.২	২২.৪	১৬.০	১৫.৮	১৫.৮	১৫.৭	১৫.৫	১৫.৫
বৈদেশিক খাত								
রপ্তানি (শতকরা পরিবর্তন)	১০.১	৪.২	৩০.০	১৬.০	১৬.০	১৬.৫	১৬.৫	১৭.০
আমদানি (শতকরা পরিবর্তন)	৪.২	৫.৪	৪৫.০	১৪.০	১৪.০	১৪.৫	১৪.৫	১৫.০
রেমিট্যান্স (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৯.৭	১১.০	১১.৫	১২.৪	১৩.৬	১৫.১	১৭.০	১৯.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)	২.৭	৩.৭	-০.৭	-০.৮	-০.৬	-০.৪	-০.২	০.১
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৭.৫	১০.৭	১০.০	১০.৬	১১.৮	১৩.২	১৪.৫	১৬.৭
রিজার্ভ (মাসের আমদানি হিসাবে)	৩.৮	৫.১	৩.৪	৩.২	৩.১	৩.১	৩.০	৩.০

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নোট: কাঠামোটি ২৭ মার্চ ২০১১ তারিখে হালনাগাদকৃত।